গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | ১৭ মে ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | পৃ. ১

প্রধানমন্ত্রীজি, ধনকুবেরদের সম্পদের ৫০ শতাংশ করোনা মোকাবিলায় ব্যয় করতে বাধ্য করুন

দাবি দেশবাসীর

করোনা অতিমারির ভয়াবহ বিপদ মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর জন্য অনলাইন দাবিপত্রে স্বাক্ষর করতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ দেশের জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। দাবিপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

করোনা অতিমারির মারাত্মক প্রথম অভিঘাত কাটিয়ে উঠার আগেই দ্বিতীয় অভিঘাত এসে পড়ল। প্রথম আক্রমণেই করোনা হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে বেকারে পরিণত করেছে। আপনার সরকার এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তখন আপনি নিজে 'নমস্তে ট্রাম্প' উৎসবে মত্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ পৌঁছানোর সতর্কতা ইউরোপের দেশগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছিল এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপনি বেশ খানিকটা সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি কিছুই করলেন না। কারণ সেই সময়ে আপনি ব্যস্ত ছিলেন

দাবিপত্রে অনলাইন স্বাক্ষর দিন

https://forms.gle/NYizMRDYhkmj2FcX6

কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রামমন্দির নির্মাণে, সেন্ট্রাল ভিস্টার রূপায়ণে এবং পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের নেশায় মশগুল হয়ে। দেশ এখন দেখছে মৃত্যুর মিছিল। কেউ জানে না কোথায় গিয়ে এই মিছিল শেষ হবে।

দেশের সর্বত্রই এখন হাসপাতাল, বেড, আইসিইউ, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, ওষুধ, চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীর অভাব। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আরও বহু লক্ষ মানুষ মারা যাবে। বহু মানুষ এমনকি হাসপাতালের গেটে, রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে। শ্মশান এবং কবরস্থানগুলিতে মৃতদেহের স্তূপ, বাইরে মৃতদেহের দীর্ঘ সারি। বহু মানুষের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানেসেখানে। এমনকি পথ-কুকুরে পড়ে থাকা মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে। যে দেশ 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের' বড়াই করে এই হচ্ছে সেই দেশের নজিরবিহীন ভয়ঙ্কর চেহারা। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কি অনিবার্য ছিল? একে কি কোনও ভাবেই এড়ানো যেত না? এই অপরাধজনক অবহেলা এবং অমানবিকতার জন্য দায়ী কে? এখন যখন করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ গোটা দেশকে গ্রাস করেছে এবং ক্রমাগত আরও

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী- বিধায়কদের গ্রেপ্তার প্রতিহিংসামূলক

রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

'দেশ ও রাজ্য জুড়ে কোভিড সংক্রমণের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অপরাধপূর্ণ অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যখন মূলত দায়ী তখন প্রয়োজন ছিল দলমত নির্বিশেষে যুক্তভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। তা না করে একদিকে রাজ্যপাল বিজেপি নেতার মতো সফর করছেন, অন্যদিকে প্রকৃত বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অপরাধ প্রমাণের পর গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের আইনি পদ্ধতি মেনে চলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারও তার এজেন্সি দিয়ে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী বিধায়কদের গ্রেপ্তার করাচ্ছে। এসবই নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। এগুলি বিজেপির প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রকাশ। আমরা বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।'

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান

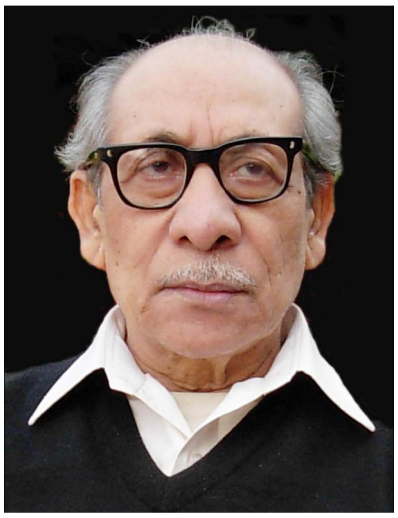

এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরোর প্রাক্তন সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র প্রাক্তন সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী সুদীর্ঘ অসুস্থতার পর ৮ মে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে, যখন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার কালীধন ইনস্টিটিউটের ছাত্র, সেই সময় তিনি কমরেড প্রভাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং নানা রকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্ত হন। সেই সময় থেকেই তিনি ধীরে ধীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেন এবং ক্রমশ দলের কাছাকাছি আসেন। পরে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং সেই পরিচয় ও আলাপ তাঁর মনে এতটাই গভীর ছাপ ফেলে যে তিনি দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন, এবং নিজেকে একজন সত্যিকারের বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলতে মার্কসবাদ লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে উপব্ধি করার সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে যখন ডিএসও'র সারা ভারত প্রতিষ্ঠা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কমরেড প্রভাস ঘোষ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তখন অন্যতম যুগ্ম সহসম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। এরপর তাঁর পরিবার দক্ষিণ কলকাতার আবাস ছেড়ে উত্তর কলকাতার দমদমে চলে গেলে তিনি দমদমেই দলের ইউনিট গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে তিনি এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে দিল্লিতে দলের সংগঠন গড়ে তুলতে তাঁকে সেখানকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

১৯৬৯ সালে একটি যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে সংগঠন গড়ে তুলতে দলীয় নেতৃত্ব তাঁকে কেরালা পাঠান। এরপর থেকে শুধুমাত্র কেরালা নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতেই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর উপরেই অর্পিত হয়। দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পার্টির সাংগঠনিক প্রসারের অনেকটাই তাঁর কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার ফল। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি এমন বহু কমরেডকে দলে আনেন, যাঁরা পরবর্তীকালে দলের সংগঠনের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করছেন। এরপর নেতৃত্বের পরামর্শে তিনি পশ্চিমের কিছু রাজ্যেও দলের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে শুরু করেন। ২০০৯ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দলের দ্বিতীয় কংগ্রেস-এর আয়োজনে তাঁর

দুয়ের পাতায় দেখুন

জেরুজালেমে ইজরায়েলি হানাদারি বন্ধ কর

প্রভাস ঘোষ

জেরুজালেমে ইজরায়েলি হানাদারির নিন্দা করে ১২ মে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন,

ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে জেরুজালেম বরাবরই প্যালেস্টাইনের অংশ ছিল। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মদতপুষ্ট হয়ে ইজরায়েল বলপূর্বক জেরুজালেম দখল করে নেয়। এরপর থেকে ওই অঞ্চলে বহুকাল ধরে বংশপরম্পরায় বসবাসকারী প্যালিস্তিনীয়দের উৎখাত করতে শুরু করে ইজরায়েলি শাসকরা। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে প্যালিস্তিনীয়রা প্রতিবাদ জানায়। তাদের এই ন্যায্য প্রতিবাদ দমন করতে ইজরায়েলি শাসকরা সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

আমরা এই হানাদারির দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করছি এবং ওই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হওয়ার জন্য ভারতের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

ধনকুবেরদের সম্পদের ৫০ শতাংশ করোনা মোকাবিলায় ব্যয় করতে বাধ্য করুন

একের পাতার পর

ছড়িয়ে পড়ছে, তখনই তৃতীয় ঢেউ ওঠার মারাত্মক আশঙ্কা কড়া নাড়ছে।

আরও মারাত্মক ক্ষতি রুখবার জন্য অগণিত দেশবাসীর মধ্যে ১০০ জন ভারতীয় বহু শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। যাদের মধ্যে ৬৩ জনই ২৯ লক্ষ কোটি টাকার মালিক। এই জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় জন্য তাঁদের

দেশজুড়ে অনলাইন গণস্বাক্ষর কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অমিতাভ চ্যাটার্জী, মানব বেরা ও অশোক সামন্ত

যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, এমনকি সেনাবাহিনী নামিয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি— ১) নগর ও শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে হাসপাতাল তৈরি করতে হবে, ২) যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসাকর্মী, প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা করে প্রতিটি হাসপাতালকে সুসজ্জিত রাখতে হবে, ৩) সেনা হাসপাতালগুলিকে সাধারণের জন্য খুলে দিতে হবে, ৪) সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করতে হবে, ৫) ওষুধ, অক্সিজেন প্রভৃতি নিয়ে কালোবাজারি যে কোনও মূল্যে বন্ধ করতে হবে।

আমরা জানি উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের প্রস্তাব— ক) অক্সফাম রেকর্ড অনুযায়ী প্রত্যেককে ৫০ শতাংশ অর্থ দান করার জন্য বলা হোক, খ) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্র এবং সব রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের এক বছরের বেতন, যা তাঁরা জনগণের দেওয়া অর্থ থেকেই পেয়ে থাকেন, তা তাঁরা এই খাতে ব্যয় করুন, গ) পিএম কেয়ার্স ফান্ড প্রকাশ্যে আনা হোক এবং অতিমারি মোকাবিলায় এর পুরো টাকা ব্যয় করা হোক, ঘ) শিক্ষাখাত ছাড়া অন্য সব খাতের বাজেট কমিয়ে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাড়ানো হোক। এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত বিশেষ অর্থভাণ্ডার উপরোক্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও কর্মচ্যুত শ্রমিক, বেকার এবং দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সাহায্যদানে ব্যয় করা হোক। এটাই এই সময়ের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। আশা করি আপনি আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেবেন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান

একের পাতার পর

ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে দলের যে ঐতিহাসিক মিছিল হয় তার আয়োজনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরোর অন্তর্ভুক্ত হন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটবুরোর সদস্য হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন।

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রবল শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে বাঙ্গালোরের সেন্ট মার্থা হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর নিম্ন শ্বাসনালীতে সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে কমরেড প্রভাস ঘোষ অবস্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ডাক্তারদের একটি দলকে ব্যাঙ্গালোর পাঠান। তাঁদের কাছ থেকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জরুরি ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য কলকাতা আনার পরামর্শ দেন। সেইমতো কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে কলকাতায় এনে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক ও হসপিটালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের অনেকগুলি প্রাচীরের কোষেই রক্ত সঞ্চালনে বাধা তৈরি হওয়ায় অক্সিজেন পৌঁছচ্ছে না (ডাক্তারি পরিভাষায় গ্রস ইসকেমিয়া অব মাল্টিপল ওয়ালস অব হার্ট) , তার ফলে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পেরে ফেল করার দিকে যাচ্ছে; সেইসাথে ফুসফুসের প্রবল সংক্রমণ ও প্রদাহের ফলে (সিওপিডি) দেহে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে তখনই একটি অ্যানজিওপ্লাস্টি করে হৃৎপিণ্ডের একটি প্রধান ধমনী থেকে ব্লকেজ সরানো হয়।

এর ফলে তাঁর অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয় এবং বিপদ তখনকার মতো কাটে। কিন্তু এরপর থেকে তিনি কখনওই আর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিয়মিত তত্ত্বাবধানে তাঁকে এরপর থেকে কলকাতাতেই থাকতে হয়। প্রায়শই তাঁর স্বাস্থ্য পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হত এবং সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ত যে, তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হত। শেষবার ১ মার্চ প্রবল শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তাঁকে আবার ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দেখা যায়, তাঁর কিডনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থার ধীরে ধীরে ক্রমাবনতি হতে থাকে। ফুসফুসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়, দেহে সেপসিস ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত মাল্টি অর্গান ফেলিওর-এর ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কেন্দ্রীয় কমিটি সারা দেশে দু'দিনের শোক পালনের ডাক দেয়। সমস্ত কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

তাঁর মরদেহ ওই দিন বিকাল তিনটা নাগাদ লেনিন সরণিতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হয়। কোভিড বিধি মেনে নানা এলাকা থেকে নেতা কর্মীরা জড়ো হয়েছেন ততক্ষণে। প্রথমেই সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ। কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড মানিক মুখার্জী সহ অন্যান্য অনুপস্থিত প্রবীণ পলিটবুরো সদস্যসদের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। কমরেড গোপাল কুণ্ডু, ছায়া মুখার্জী, সৌমেন বসু, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও মাল্যদান করেন। দলের গণসংগঠনগুলির সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক পরিবেশন করেন উপস্থিত কর্মীরা।

এরপর শবদেহবাহী গাড়িকে সামনে রেখে রক্তপতাকা সহ বাইক মিছিল করে কমরেডরা সামিল হন শেষ যাত্রায়। মরদেহ এ আই ইউ টি ইউ সি অফিস ঘুরে কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছালে সেখানে উপস্থিত দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা লাল সেলাম ধ্বনিতে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী লাল সেলাম

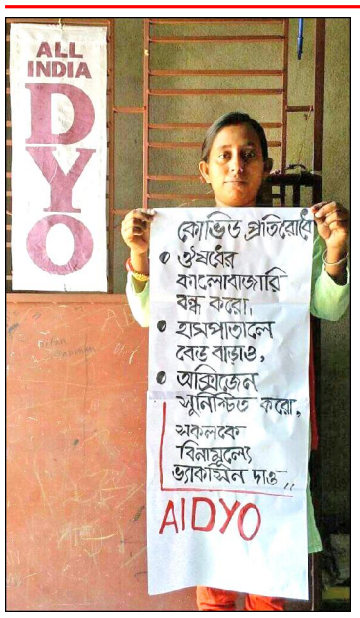

১৭ মে রাজ্যজুড়ে এআইডিওয়াইও-র প্রতিবাদ দিবস পালন

সবার জন্য ভ্যাক্সিন, সবার কোভিড পরীক্ষা, হাসপাতালে বেড বাড়ানো, অক্সিজেন সুনিশ্চিত করা, কাজ হারানো মানুষদের দায়িত্ব গ্রহণ, সেন্ট্রাল ভিস্টা বাতিল করা প্রভৃতি দাবিতে ১৭ মে এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সর্বত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীক ও প্রশাসনিক দপ্তরে এদিন প্রায় ১৫০০ যুব কর্মী অনলাইনে দাবিপত্র পেশ করেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর প্রতিবাদ কর্মসূচি সফল করার জন্য যুব সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশকে এমন মৃত্যুপুরীতে পরিণত করার জন্য দায়ী কারা

জনগণের কাছে গোপন নেই

এখন আর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অতিমারির এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ৩ লক্ষ ছুঁতে চলা মৃত্যু, দৈনিক চার লক্ষ মানুষের সংক্রমণের ঘটনার জন্য মূলত দায়ী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অপদার্থতা। করোনার প্রথম ঢেউ চলে যাবার পর আসন্ন দ্বিতীয় ঢেউ সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুতির যে সময় সরকার পেয়েছিল তাকে ঠিকমতো কাজে লাগালে পরিস্থিতির মোকাবিলা আজ এত কঠিন হত না। অথচ দেশি এবং বিদেশি নানা চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। সরকার সেই সতর্কবার্তায় কান দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার তাদের আসল কর্তব্য ভুলে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রথম ঢেউ মোকাবিলার সাফল্য আত্মসাৎ করে নরেন্দ্র মোদির 'বিশ্বনেতা'র ইমেজ তৈরিতে। অথচ এই সময়ে শুধু ভারতে নয় গোটা বিশ্বে এমনিতেই ধীরে ধীরে রোগের প্রকোপ অনেকখানি কমে এসেছিল।

প্রধানমন্ত্রী গত জানুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সভায় গর্ব জাহির করে বললেন, 'বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ভারতে কোভিড সংক্রমণের সুনামি আসবে। আজ ভারতে কোভিড কেস দ্রুত কমছে। ... সারা বিশ্বকে অতিমারির সঙ্গে লড়তে সাহায্য করছি।' চিত্রনাট্য সাজানোই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির জাতীয় পদাধিকারীদের বৈঠকে প্রস্তাব নেওয়া হয়ে গেল (২১ ফেব্রুয়ারি) 'গর্বের সঙ্গে বলা যায়, নরেন্দ্র মোদির দক্ষ, সংবেদনশীল, দায়বদ্ধ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত কোভিডকে পরাজিত করেছে।' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে (৮ মার্চ) বললেন, 'আমরা অতিমারির শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি।' এই যদি গোটা সরকার এবং সরকারি দলের মনোভাব হয় তবে তারা যে করোনা অতিমারির মতো এক ভয়ঙ্কর আক্রমণের মোকাবিলা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে আর কারও সন্দেহ থাকে কি?

সরকারের এই আত্মসন্তুষ্টি এবং নিজেদের চ্যাম্পিয়ন প্রমাণ করার উদগ্র চেষ্টাই তাদের গা-ছাড়া মনোভাবের দিকে ঠেলে দেয়। এই মনোভাব থেকেই সরকার প্রতিষেধক উৎপাদনে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি। যেটুকুওবা উৎপাদন হয়েছে, বিশ্বনেতা হওয়ার লোভে সেগুলির একটা বড় অংশকেই প্রধানমন্ত্রী নানা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ শতাংশ মানুষকেও টিকা দেওয়া যায়নি। টিকার জন্য হাহাকার চলছে দেশ জুড়ে। অথচ যথাসময়ে টিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে, মূলত একটি বেসরকারি সংস্থার উপর দায়িত্ব দিয়ে চোখ বন্ধ করে না ফেললে, রাষ্ট্রায়ত্ত আরও যে বহু প্রতিষ্ঠান নানা রকমের টিকা উৎপাদন করে তাদের হাতে প্রযুক্তি ও পেটেন্টের অধিকার তুলে দিলে আজ এই হাহাকারের পরিস্থিতি তৈরি হত না। এখন বিদেশ থেকে যেসব টিকা আমদানি করা হচ্ছে, বেসরকারি কোম্পানিগুলি তার যে চড়া মূল্য ধার্য করেছে তাতে দেশের বিরাট সংখ্যক গরিব মানুষের পক্ষে টিকা নেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। তা হলে দেশের এই বিরাট অংশের মানুষকে টিকা নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে করোনার মোকাবিলা কি আদৌ সম্ভব? বাস্তবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যখন উচিত ছিল গোটা মন্ত্রিসভাকে নিয়ে কোভিড মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়া তখন তিনি সেই দায়িত্বে চরম অবহেলা করে বাংলার ক্ষমতা দখলের জন্যই কার্যত গোটা মন্ত্রিসভাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং নিজে ডেলি প্যাসেনজারি করেছেন।

আসন্ন দ্বিতীয় ঢেউকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার মোকাবিলার জরুরিকালীন প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজন ছিল সরকারি হাসপাতালে আরও বহু সংখ্যায় বেড বাড়ানো, অক্সিজেনযুক্ত বেড বাড়ানো, আইসিইউ, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা বাড়ানো। দরকার ছিল আরও অনেক কোভিড-হাসপাতাল তৈরি করা, সমস্ত বড় হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট বসানো, জীবনদায়ী ওষুধের উৎপাদন বাড়ানো, করোনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিটের উৎপাদন বাড়ানো, সরকারি হাসপাতালগুলিতে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যায় চিকিৎসক-নার্স অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়ানো, সেগুলির মান উন্নত করা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে মজবুত করা। বলা বাহুল্য দেশের মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং অপদার্থতা আজ ভয়ঙ্কর ভাবে প্রকট। এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল স্বাস্থ্যখাতে সর্বোচ্চ পরিমাণে বরাদ্দ করা। তা করা হয়নি। এমনকি স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ চেয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যে সুপারিশ করেছিল তাও কার্যকর করা হয়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রের অর্থনীতি বিষয়ক সচিব অজয় শেঠ এক আলোচনাসভায় স্বীকার করেছেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে জনস্বাস্থ্য খাতে ভারতের ব্যয় সবচেয়ে কম। অথচ প্রধানমন্ত্রী এবং সব বিজেপি নেতারাই করোনা শুরুর আগের দিন পর্যন্ত ভারতকে তারা যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করতে চলেছেন, বুক বাজিয়ে তা প্রতিদিন ঘোষণা করতেন। তা যদি সত্য হয় তবে সেই অর্থনীতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোন কাজে লাগল বিজেপি নেতারা তার কী উত্তর দেবেন? অর্থের অভাবই কি এই কাজগুলি সম্পন্ন করার পথে বাধা হয়েছে, নাকি জনগণের প্রতি বিজেপি সরকারের মনোভাবই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য দায়ী? না হলে এই সরকারই অনায়াসে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মূর্তি তৈরি করে কী করে? কী করেই বা কুড়ি হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাধের বাসভবনের জন্য, নতুন পার্লামেন্ট ভবন তৈরির জন্য, দিল্লির সৌন্দর্যায়নের জন্য 'সেন্ট্রাল ভিস্টা'র পিছনে খরচ করে?

করোনার ওষুধ এবং বিভিন্ন চিকিৎসা যন্ত্রাংশ নিয়ে এই পরিস্থিতিতেও দেশ জুড়ে চলছে ব্যাপক কালোবাজারি। তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিকভাবে পদক্ষেপ না করে তার মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দিয়েছে। সারা দেশে গ্রামাঞ্চল জুড়ে করোনা সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। গ্রামবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধির দায়িত্ব পঞ্চায়েতের ওপর ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ফোনের কলার টিউনে প্রতি মুহূর্তে জনগণকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। অথচ দেশের বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মানুষ যাতে মাস্ক ব্যবহার করতে পারে তার জন্য বিনামূল্যে তা সরবরাহ করার দায়িত্বটুকুও সরকার নেয়নি। একদল সরকারি বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ সরকারি ব্যর্থতাকে আড়াল করতে দ্বিতীয় ঢেউয়ের দায় দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, মাস্ক না পরা, কোভিড প্রোটোকল না মানা এর জন্য দায়ী। করোনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু মাস্ক পরে এই মহামারির জীবাণুকে আটকানো যাবে না। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজটি এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য দেশের জনগণকে কি সহায়তা করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার? দিল্লি সহ সারা দেশে অজস্র বস্তিতে অত্যন্ত ঘিঞ্জি পরিবেশে যে কোটি কোটি মানুষ বাস করে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

করোনার প্রথম আক্রমণের পরই হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনকে নরক করে তুলেছিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

মজুতদারি আইনসিদ্ধ করায় রান্নার তেলের ডবল ইঞ্জিন মূল্যবৃদ্ধি

রান্নার তেলের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। সরষের তেল, সয়াবিন তেল, পাম তেল, সূর্যমুখী তেল ইত্যাদি যত ভোজ্য তেল আছে সব কিছুরই দাম গত এক বছরে লিটার প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা বেড়েছে। এই মুহূর্তে খোলাবাজারে সরষের তেলের দাম ২০০ টাকার কাছাকাছি। এত অল্প সময়ে এই মূল্যবৃদ্ধি নজিরবিহীন। এই মূল্যবৃদ্ধির একটি ইঞ্জিন পুঁজিবাদী মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনীতি। অপর ইঞ্জিনটি হল প্রধানমন্ত্রী মোদির অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন ও মজুতদারি আইন সিদ্ধ করা। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও তার পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকারের জোড়া ফলা মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত।

গত বছর লকডাউনের সময় পার্লামেন্টে যথেষ্ট আলোচনার সুযোগ না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে তিনটি কৃষি আইন পাশ করিয়েছিলেন। তার মধ্যে আছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন। এই আইনে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তৈলবীজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় তালিকার বাইরে আনা হয় এবং এগুলি যথেচ্ছ পরিমাণে মজুত করে রাখার আইনি বৈধতা দেওয়া হয়। এর পর থেকেই রান্নার তেলের দাম বৃদ্ধি স্বাভাবিক হার ছাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে।

এই আইন অনুযায়ী সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা ভাববে একমাত্র দাম দ্বিগুণ হলেই। তার মানে কি তারা দাম কমাবে? যখন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন পুরোমাত্রায় বহাল ছিল, তখনও কি কমিয়েছে? জনগণের অভিজ্ঞতা, দাম একবার বাড়লে কমে না। তবে কখনও কখনও ১০০ টাকা বাড়িয়ে ১ টাকা কমানোর নির্লজ্জ প্রতারণা চলে।

পুঁজিবাদী সমাজে এই মূল্যবৃদ্ধি এড়ানোর উপায় নেই। তবে নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় আছে। যেমন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ভোঁতা করে না রেখে কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে মজুতদারদের গ্রেফতার ও শাস্তি দিলে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরকারি বাণিজ্য চালু করলে মূল্যবৃদ্ধির আগুন থেকে মানুষকে কিছুটা বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু সেটাও সরকার করবে না তীব্র গণ আন্দোলনের চাপ না থাকলে।

বর্তমানে করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের রোজগারে ধস নেমেছে। পিউ রিসার্চ রিপোর্ট উল্লেখ করে ইতিপূর্বে গণদাবী দেখিয়েছে, ১৩৮ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ১৩০ কোটিরই ক্রয়ক্ষমতা এমন স্তরে নেই, যাকে ভিত্তি করে দেশে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। লকডাউনের ফলে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে। এখন দরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক ত্রাণ প্যাকেজ দেওয়া, দরকার মূল্যবৃদ্ধি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে জনগণকে স্বস্তি দেওয়া। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এসব করার কোনও লক্ষণ নেই।

করোনা অতিমারির কারণে আজ গণজমায়েত করে প্রতিবাদের উপায় নেই। এখন আন্দোলনের নতুন নতুন প্রকরণ খুঁজতে হবে। সোস্যাল মিডিয়ায় সরকারের জনবিরোধী ভূমিকা নগ্ন করে দিয়ে প্রচারের ঝড় তুলতে হবে। আর ভুক্তভোগী জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে, মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে এবং মালিক শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে বুর্জোয়া দলগুলি যতদিন সরকার চালাবে, ততদিন মূল্যবৃদ্ধির এই ভয়ানক আক্রমণ চলতেই থাকবে। ফলে জনগণকে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সরকারগুলির জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। একই সঙ্গে শক্তিশালী করতে হবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কর্মসূচি নিয়ে চলা বামপন্থী রাজনৈতিক দলকে। বলা বাহুল্য বাম দলগুলোর মধ্যে এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া আর কোনও দলেরই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কার্যক্রম নেই।

কেরালায় এলডিএফ-এর জয় বামপন্থার জয় নয়

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এস ইউ সি আই (সি)-র কেরালা রাজ্য কমিটির বিবৃতি

সদ্য অনুষ্ঠিত কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে এলডিএফ জোটের জয় প্রকৃত বামপন্থী রাজনীতির জয় বলে মনে করে না এস ইউ সি আই (সি)-র কেরালা রাজ্য কমিটি। যে দায়িত্বগুলি পালন করলে কোনও বামপন্থী সরকারকে একটি দক্ষিণপন্থী সরকারের থেকে মৌলিক ভাবে পৃথক করা যায়, পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকার সেগুলি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমস্ত নীতিই বৃহৎ পুঁজিপতি ও সমাজের ধনী অংশের মুনাফা-শিকার ও বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ভোটের ফল প্রকাশের ঠিক পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগেরবার এলডিএফ সরকারের নীতি ছিল সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যবস্থা করা— এবারেও সেই নীতিই অনুসরণ করা হবে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কেরালা শাখা এলডিএফ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সুযোগসুবিধাগুলির কথা স্মরণ করে এই সরকারের পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছে, তা থেকে পরিষ্কার যে, এই সরকারের মূল নীতিগুলিকে শিল্পমহল কীভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

একটি বাম সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল জনগণের সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাই একটি বামপন্থী সরকার দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলা থেকে বিরত থাকবে, এটাই হওয়া উচিত। কেরালার এলডিএফ সরকার ঠিক এর বিপরীত কাজটাই করেছে। প্রকৃত বাম রাজনীতির সঙ্গে বেমানান এই নীতিগুলোর কারণেই যদি কেরালায় এই জয় এসে থাকে তাহলে একে কোনও মতেই বামপন্থী রাজনীতির জয় হিসাবে দেখা চলে না।

এই জয়ের পিছনে আরও একটি বিষয় রয়েছে। সেটি হল, জনগণের জন্য যেসব সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যকলাপ করা হয়েছে, সেগুলির ব্যাপক প্রচার সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে প্রশমিত করেছে। বিপদের সময়ে সরকারি সাহায্য পাওয়া যে দেশবাসীর অধিকারের মধ্যে পড়ে— এই রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসারের পরিবর্তে, শাসকদের দয়ার দানের উপর নির্ভরশীলতার মানসিকতা তৈরির এই অপচেষ্টা, আর যাই হোক, বামপন্থী রাজনীতি নয়। বামপন্থী রাজনীতির প্রকৃত দায়িত্ব হল, নির্ভরশীলতা এবং দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত করে জনগণকে এমনভাবে শিক্ষিত করা যাতে তারা সরকারি নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। দক্ষিণপন্থী সরকারগুলিও জনপ্রিয়তা লাভের জন্য অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সাহায্য দেওয়ার নানা প্রকল্প গ্রহণ করে। বিপদের সময়ে জনগণের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা ও নানাভাবে তাদের সাহায্য দেওয়া একটি সরকারের ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ভোটে এলডিএফ জোটের জয়ের অর্থ এই নয় যে এদেরই তৈরি পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি ভিত্তিহীন কিংবা সেগুলি জনগণ মেনে নিয়েছে। চূড়ান্ত অরাজনৈতিক কায়দায় সংঘটিত এই নির্বাচনে জাতীয় বা রাজ্য স্তরের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। অর্থাৎ এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে জনগণ এই নির্বাচনে তাদের মত প্রকাশ করেনি।

ভোটের এই ফলে প্রকাশিত হয়েছে বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র বিরোধিতা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের বিরক্তিকে এলডিএফ বা ইউডিএফ জোট কেউই রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত করতে পারেনি। ভোট কেনাবেচার জন্য বিজেপির ভোট কমেছে, এই তত্ত্ব খাড়া করে সিপিআই(এম) দেখানোর চেষ্টা করছে যে নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলির কোনও প্রভাবই পড়েনি।

নির্বাচনী প্রচারে এই ফ্রন্টগুলি ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আবেগ খুঁচিয়ে তুলে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। শবরীমালা কাণ্ড, লাভ জিহাদ, মুসলিম বিরোধী কুকথা ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলা হয়েছিল। বিজেপির দিকে লক্ষ্য রেখে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাও ব্যবহৃত হয়েছিল। নায়ার সম্প্রদায়ের সংগঠন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, খ্রিস্টানদের সংগঠন ইয়াকোভায়া সভা, মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা ইত্যাদির সঙ্গে আঁতাত করা হয়েছিল যাতে ভোটে তার ফয়দা তোলা যায়। গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপট জুড়ে সুবিধাবাদ এবং অনৈতিক কার্যকলাপ চলেছে। মাত্র কয়েকটা আসনের জন্য ফ্রন্টগুলি যে কোনও ধরনের ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। এলডিএফ যে মানি কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে গত নির্বাচনে দাগিয়ে দিয়েছিল, এ বছর সেই দলটিকেই তারা কাঁধে নিয়ে ঘুরেছে। বাম রাজনীতির সঙ্গে এতটুকু সম্পর্ক নেই এমন অনেককে তারা প্রার্থী করেছে। এলডিএফের জয়ের পেছনে অন্যতম একটি কারণ হল, এই জোটটি অন্য দুটি জোটকে সাম্প্রদায়িক এবং অনৈতিক রাজনীতির প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে দিয়েছে। আশু সুবিধার লক্ষ্যে এই ধরনের অপরাজনীতি আমদানি করার কঠিন দাম ভবিষ্যতে চোকাতে হবে কেরালাকে।

জনগণের সামনে সঠিক পথ হল, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে চলা মহান বামপন্থী রাজনীতির পক্ষ নেওয়া। এলডিএফের জয়ের জন্য যারা কাজ করেছেন তারা সহ সমস্ত বামমনস্ক

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পুরুলিয়া লোকাল কমিটির সদস্য, রিক্সাশ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড বিজয় বাউরী ৯ মে তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু দলের কর্মী বা তাঁর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যেই নয়, এলাকার মানুষের মধ্যেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পুরুলিয়ার অতি দরিদ্র রিক্সাচালক পরিবারের সন্তান বিজয় বাউরী প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। একেবারে কিশোর বয়স থেকেই রিক্সা চালিয়ে উপার্জন করে সংসারে সাহায্য করতে হত। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক প্রতিবাদী মন। যে কারণে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় পুরুলিয়া শহরে রিক্সা ও বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে সিপিআইএমের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে তিনি সিপিএমের সুবিধাবাদী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিপিআই(এম এল) পরিচালিত আন্দোলনে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁকে জেলে বন্দি হতে হয়। বহু মিথ্যা মামলায় হয়রানি এবং পুলিশি অত্যাচারও সহ্য করতে হয়।

ধীরে ধীরে এইসব মেকি বামপন্থী দলগুলির প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয় এবং তিনি তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু কমিউনিজম ও বামপন্থার প্রতি আস্থা হারাননি। পুরুলিয়া শহরে তখন এস ইউ সি আই (সি) দলের কোনও সংগঠন ছিল না। ১৯৭৫ সালের শেষদিকে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ পুরুলিয়ায় রিক্সাশ্রমিক সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিলে তাঁর সাথে কমরেড বিজয় বাউরী সহ আরও কয়েকজন রিক্সাশ্রমিকের পরিচয় ঘটে। তাঁর মাধ্যমেই কমরেড বিজয় বাউরী এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময় সিপিএম পরিচালিত পুরুলিয়ার রিক্সাশ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রিক্সাশ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী নানা পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হয়। তার বিরুদ্ধে কমরেড বিজয় বাউরী ও কমরেড ফকির বাউরীর নেতৃত্বে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে নতুন করে রিক্সাশ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন শুরু হয় এবং তার প্রভাব সারা জেলায় ছড়িয়ে যায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রিক্সাশ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি আদায় হয়। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই আন্দোলন রিক্সাশ্রমিকদের হীনমন্যতাবোধ থেকে মুক্ত করে এক নতুন মর্যাদাবোধে উত্তরণ ঘটায়। কমরেড বিজয় বাউরীর মধ্যে সেই মর্যাদাবোধেরই প্রকাশ ঘটেছিল। সে কারণে তিনি শুধু রিক্সাশ্রমিকদের মধ্যেই নয়, ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী সহ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষজনের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি রিক্সা চালাতে চালাতেই সওয়ারিদের সাথে সহজ ভাষায় রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। এমনকি একবার নির্বাচনের সময় কলকাতার এক সাংবাদিক তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে একেবারে পরিষ্কার ভাষায় এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনৈতিক বক্তব্য শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি ছিল গভীর। সংস্কৃতির সুরটিও ছিল উচ্চমানের। তিনি সচেতনভাবেই দলের রাজনীতি আত্মস্থ করার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

কমরেড বিজয় বাউরী বেশ কিছু বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন। দলের চিন্তার সংস্পর্শে এসে তাঁর এই সব গুণাবলি বিকশিত ও উন্নত হয়ে ওঠে। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সম্মান না জানিয়ে পারেননি। পাড়াপ্রতিবেশীরা যে কোনও সমস্যায় তাঁর সাহায্য চাইতেন। গোটা পরিবারকেই তিনি নির্দ্বিধায় পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কার্যত, তাঁর পরিবারটাই হয়ে উঠেছে পার্টিরই পরিবার। তাঁর স্ত্রী-কন্যা সকলেই দলের দায়িত্বশীল কর্মী। তাঁর ভাইও দলের নির্ভরযোগ্য কর্মী ছিলেন। কমরেড বিজয় বাউরীর মা ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। দলের কর্মীদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা সব সময় খোলা। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও তাঁকে কেউ আক্ষেপ করতে দেখেনি বা কোনও কমরেড তাঁর বাড়ি থেকে না খেয়ে ফিরে আসেননি। দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। কিন্তু দলের চিন্তার সাথে মেলে না এরকম কিছু দেখলে সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। একইভাবে, দলের নেতাদের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও কোথাও ত্রুটি হচ্ছে মনে হলে অসংকোচে বলার ক্ষমতা রাখতেন।

পার্টির তত্ত্ব চর্চায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। রিক্সাস্ট্যান্ডগুলিতে অবসর সময়ে তিনি পার্টির বই, গণদাবী অন্যান্য প্রকাশনা নিজে পড়তেন ও অন্যদেরও পড়াতেন। এইভাবে রিক্সাস্ট্যান্ডগুলিতে ও নিজের পাড়ায় একটা রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি পুরুলিয়া শহরের যে কোনও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে সামনের সারিতে থাকতেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকত। তাঁর বাড়ির পাশেই বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাওয়া বেশ কিছু জমি স্থানীয় গৃহহীন মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে লড়াই করে উদ্ধার করেন এবং তা গরিব মানুষের মধ্যে বন্টন করেন। এই ধরনের বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন উন্নতমানের কমরেডকে এবং সাধারণ মানুষ হারাল তাদের এক সুখ-দুঃখের সাথীকে।

কমরেড বিজয় বাউরী লাল সেলাম

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রুখতে গণআন্দোলনই বিকল্প

পশ্চিমবঙ্গে ভোট শেষ হয়েছে। এ রাজ্যে বিজেপি গদি দখলে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় এবং রাজ্য নেতাদের অশ্লীল এবং চরম সাম্প্রদায়িক উচ্চকিত প্রচার আপাতত থেমেছে। বিজেপির এই ব্যর্থতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। একই সাথে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত ভোটেও বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। বারাণসী, অযোধ্যা সহ বহু জায়গাতেই তাদের ফল অত্যন্ত খারাপ।

কিন্তু বিজেপিকে নির্বাচনী লড়াইতে পরাস্ত করার পিছনে কি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থাই কাজ করেছে? ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের কথা কিছু কম শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু সে ক্ষোভ বিক্ষোভের প্রতিফলন ভোটের মেশিনে বিশেষ পড়েনি। তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব যদি ভেবে নেন তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল, তাহলে জনমতের প্রতি চরম অসম্মান করবেন তাঁরা। বস্তুত, বিজেপি বিরোধী প্রবল জনমতই জিতিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

এই নির্বাচনের আগে সারা ভারতেই গণতান্ত্রিক বোধ সম্পন্ন মানুষ অওয়াজ তুলেছিলেন, 'নো ভোট টু বিজেপি'— বিজেপিকে একটিও ভোট নয়। ২০১৯ সাল থেকেই এনপিআর-এনআরসি-সিএএ বিরোধী যে আন্দোলন দেশে দানা বাঁধছিল ২০২০ তে এসে তা কিছুটা থমকে গিয়েছিল করোনার কারণে। কিন্তু এই আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল একদিকে গণতন্ত্র প্রিয় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ। প্রথম থেকেই সঠিক বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি) সারা ভারতেই বিজেপি সরকারের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রচেষ্টাতেই সমাজের নানা স্তরের মানুষকে যুক্ত করে গড়ে উঠেছে 'এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি'। যাতে দলমত নির্বিশেষে আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সহ ছাত্র-যুব-মহিলারা সামিল হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, দলিত, ও আদিবাসী সহ নানা জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিজেপি সিএএ-কে নিয়ে যে মিথ্যা খোয়াব দেখানোর চেষ্টা করছিল তাকে অনেকটাই প্রতিহত করার কাজ করেছে এই এনআরসি বিরোধী গণকমিটি এবং তার নেতৃত্বে আন্দোলন।

বিজেপি সরকার করোনা মহামারির মধ্যে ৩টি কৃষক বিরোধী কৃষি আইন পাশ করিয়ে নেয়। কিন্তু ২০২০-র নভেম্বর থেকে যে একটানা কৃষক আন্দোলন দিল্লি সীমান্তে চলছে তা সারা দেশের সামনে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী চরিত্র অনেকটা প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই কৃষক আন্দোলনের বার্তা গ্রামাঞ্চলে আলোড়ন তুলেছে। কিন্তু তাকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)। বৃহৎ বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএম তার সাংগঠনিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এ নিয়ে কোনও সুসংহত আন্দোলন গড়ে তোলেনি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিরোধিতার প্রধান দাবিদার তৃণমূল কংগ্রেস চাষিদের পক্ষে কিছু কথা বললেও কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের চটানোর ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত কিছু করেনি। শুধু তাই নয়, সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতেও কৃষি বিলের কোনও বিরোধিতা করেনি। এস ইউ সি আই (সি) দল এবং তার কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন সহ নানা গণসংগঠন লাগাতার এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচি চালিয়ে গেছে। যে প্রচেষ্টা তিল তিল করে বিজেপিকে রোখার জমি রাজ্য জুড়ে তৈরি করেছে।

বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯ এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সার্বজনীন সামগ্রিক শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। গরিব ঘরের সন্তানদের কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয় এবং কিছু হাতের কাজ শেখানোর মধ্যেই আটকে রাখার পরিকল্পনা করেছে। সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা সহ ইংরেজি শেখানোর দায়িত্বকে কার্যত ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণ করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের হল তারা শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলেই আঘাত করছে। শিক্ষার নামে কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাসকে দেশে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি) দল। এই দলের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে সেভ এডুকেশন কমিটি। যে গণকমিটি সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, শিক্ষাবিদ সহ বহু পেশার মানুষের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে বিজেপির সর্বনাশা শিক্ষানীতিকে যে কোনও মূল্যে রোখার মন-মানসিকতা তৈরি করছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মারাত্মকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেছিল। অট দফা ভোটের প্রতিটি দফাতেই প্রচারে তারা যে ভাষায় উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়েছে তা এ রাজ্যে অতীতে মানুষ কখনও শোনেনি। তাদের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরুর বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা। দেখানোর চেষ্টা করছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের রক্ষাকর্তা হল বিজেপি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হীন লক্ষ্যে এই মারাত্মক বিষাক্ত প্রচারের বিরুদ্ধে বিজেপি বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে পাল্টা নরম হিন্দুত্বের আশ্রয় নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের প্রার্থীদের কাজই হয়েছিল মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে, অথবা সভায় নানা মন্ত্র আউড়ে নিজেদের হিন্দুত্ব জাহির

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বীরভূম জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কুদ্দুস আলী ৯ মে ভোরে নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দলের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে যান। তাঁর মরদেহ জেলা কার্যালয়ে আনা হলে জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক সহ জেলা কমিটির সদস্যরা এবং গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় কিছুদিন থেকেই তিনি ভুগছিলেন। করোনা অতিমারিজনিত পরিস্থিতিতে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, বিশেষত অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আতাহার রহমানের করোনা আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে খুবই আঘাত করে। তারপর থেকেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অস্থিরতায় ভুগতে থাকেন।

কমরেড কুদ্দুস আলী মহম্মদবাজার থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর নিজ চরিত্র ও স্বভাবগুণে সুপরিচিত ছিলেন। '৫০-এর দশকের শেষ ভাগে ওই এলাকায় প্রয়াত নেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী এবং কমরেড ব্রজগোপাল সাহার নেতৃত্বে চালকল, তেলকল শ্রমিক, গরিব বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টিসংগঠন গড়ে ওঠে। '৬০ দশকের শুরুতে কমরেড কুদ্দুস আলী পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং নেতৃত্বের গভীর স্নেহ-ভালাবাসা, সাহচর্যে দলের রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে জীবনে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই পার্টির কাজ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যেও আসেন যা তাঁকে জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। তখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেই মূল্যবোধ বহন করে গিয়েছেন। ওই এলাকায় আদিবাসী সহ গরিব সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে বহু আন্দোলন গড়ে তোলেন। চায়না-ক্লে কারখানাগুলিতে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলে অনেক দাবি আদায় করেন। আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে একাধিকবার মালিকদের আক্রমণের মুখে পড়েন, এমনকি তাঁর জীবন বিপন্ন হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক সংগঠন ও ঐতিহাসিক ভাষা শিক্ষা আন্দোলনে জেলা স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এলাকায় ক্লাব, নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে নিয়মিত মনীষীচর্চা, সঙ্গীত বিদ্যালয়, নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি করতেন। পরবর্তী সময়ে এলাকা জুড়ে বৃত্তি-পরীক্ষা পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁরই হাতে গড়া 'কৃষক সংগ্রাম কমিটি' এলাকায় বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের নানা সমস্যা নিয়ে সফল আন্দোলন পরিচালনা করেছে। বহু মানুষকে সাহায্য করতেন নানা ভাবে কিন্তু কখনও তা কাউকে বলতেন না। বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে ঘুরে বিড়ি শ্রমিক এবং আশাকর্মীদের সংগঠিত করেছেন, তাদের নিয়ে আন্দোলনমুখী নানা কর্মসূচি নিয়েছেন। মানুষের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। তাদের নিয়ে সৃজনশীল উদ্যোগে কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। পরিবারকেও দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মা, স্ত্রী, বোনের কাছে পার্টি কমরেডরা ছিল অতি আপনজন।।

মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ যে উন্নত সাংস্কৃতিক মান অর্জনের সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন কমরেড কুদ্দুস আলী আজীবন সে সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। অতীতের মূল্যবোধের সাথে সর্বহারা সংস্কৃতির প্রতিফলন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁর উচ্চরুচি ও রসবোধ দলের নেতা-কর্মী সহ সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত, দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যেত। কমরেডদের বিশেষত ছোটদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তাদের নানা আবদার পূরণ করতেন। সমালোচনা গ্রহণ করার অদ্ভুত মন ছিল তাঁর। নেতৃত্বের দ্বারা বা কখনও জুনিয়ারদের দ্বারা সমালোচিত এমনকি তিরস্কৃত হলেও মুখ দেখে ব্যথা পেয়েছেন তা বোঝা যেত না। অন্যের ভুলত্রুটি যা নজরে আসত সেগুলি খুব কম কথায় বলতেন এবং তা পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী সুন্দর সুরে বাঁধা থাকত। ছোটরা কাজ করছে, দায়িত্ব নিচ্ছে দেখলে খুবই আনন্দ পেতেন। কার অধীনে কাজ করছেন এসব বিষয় কখনও ধর্তব্যের মধ্যেই থাকত না। সন্তানেরা দলের কাজ করুক চেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সে ভাবে এগিয়ে না আসায় ব্যথা পেয়েছেন খুবই। স্ত্রী বিয়োগের পর কিছুদিন একাকিত্বের সমস্যা হচ্ছিল, কিন্তু পরে পরেই পার্টির দায়িত্ব এবং কমরেডদের সাহচর্যের মধ্যেই তা কাটিয়ে তোলেন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনেও তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শরীর খারাপ না থাকলে নিয়মিত পার্টি অফিসে আসতেন। এই অতিমারির সময়ে তাঁকে বেরোতে নিষেধ করা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য অফিসে চলে আসতেন। কমরেডদের সংস্পর্শ না পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন। কমরেড কুদ্দুস আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে দল হারাল উন্নত রুচি সংস্কৃতিসম্পন্ন, বহু দুর্লভ গুণের অধিকারী এক সংগঠককে। এলাকার মানুষ হারাল তাদের সুখ-দুঃখের সাথী সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক নেতাকে।

কমরেড কুদ্দুস আলী লাল সেলাম

জনগণের কাছে গোপন নেই

তিনের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লকডাউনের ফলে লক্ষ লক্ষ ছোট মাঝারি সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। কর্মহীন হয়ে যান কয়েক কোটি মানুষ। সেই সংস্থার বেশির ভাগেরই ঝাঁপ আর খোলেনি। এ বছরও শুধু এপ্রিল মাসেই, সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র হিসেব অনুযায়ী, ভারতে ৭৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, রাজ্যে রাজ্যে আবার লকডাউন শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি কোন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছবে ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে। এই বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষগুলির প্রতি কী দায়িত্ব পালন করেছে সরকার? গত বছর রোজগারহীন মানুষগুলির জন্য কয়েক মাসে রেশন দিয়েই সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের ভাব এমন যেন, অনেক সাহায্য দিয়েছি, আর নয়। যেন এইসব কর্মহীন মানুষগুলি দেশের নাগরিক নন, যেন বেঁচে থাকার তাদের কোনও অধিকার নেই, যেন তাদের বাঁচিয়ে রাখার সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই! অথচ এখন প্রায় এক কোটি টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে জমে রয়েছে, পচে নষ্ট হচ্ছে। সরকার মদ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে লক্ষ লক্ষ টন চাল দিয়ে দিচ্ছে মদ তৈরির জন্য। জনগণ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কী করে করোনা মোকাবিলা করবেন দেশের এই বিরাট সংখ্যক মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তা ভাবার দায়িত্ব কি প্রধানমন্ত্রীর নয়? তিনি যে নিজেকে দেশসেবক হিসেবে ঘোষণা করতে সদাব্যস্ত, এই কি তার সেই দেশসেবার নজির? দেশ মানে কি শুধু আম্বানি-আদানিদের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির দল? দেশের ৯৯ ভাগ শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে তাঁরা দেশের অংশ বলে মনে করেন না?

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে দেশের মানুষ। এ অবস্থায় যখন মানুষকে বাঁচাতে করোনা মোকাবিলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা ছিল সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, তখন গোটা বিজেপি নেমে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি বাঁচাতে। এমনকি আমলাদেরও নামানো হয়েছে এ কাজে। তারা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সাথে একযোগে সরকারের 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' তুলে ধরার কাজে নেমে পড়েছেন। আরএসএসকেও নামানো হয়েছে এই কাজে। তাতেও কাজ হচ্ছে না। বিজেপির ভেতর থেকেই সরকারের অপদার্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভের উদগীরণ প্রকাশ্যে চলে আসছে প্রতিদিন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিজেপির নেতা মন্ত্রীদের গায়েও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতার আঁচ লাগছে। হাসপাতালের বেড না পেয়ে, অক্সিজেন না পেয়ে, ভেন্টিলেশনের সুযোগ না পেয়ে, এমনকি বিনা চিকিৎসায় তাঁদের আত্মীয় স্বজনরাও মারা যাচ্ছেন। অজস্র মানুষ তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। মোদি সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের বাগাড়ম্বর যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তা প্রতিদিন প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

বাস্তবিক কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ যে তীব্র সংকট তৈরি করেছে, তাতে হিন্দুত্বের আশ্রয় নেওয়ারও কোনও অবকাশ বিজেপির সামনে নেই। চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের অনেক নিষেধ সত্ত্বেও কুম্ভ মেলার অনুমতি দিয়ে সরকার যে গোটা উত্তর ভারত সহ সারা দেশে করোনার প্রকোপ দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে তা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকেই উঠে আসছে। কুম্ভ মেলার ঠাসাঠাসি ভিড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশ জুড়ে কেমন সুনামি তৈরি করেছে তথ্য গোপনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তা প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে। মধ্যপ্রদেশে কুম্ভ থেকে ফিরে আসা ৬১ জনের একটি দলের করোনা পরীক্ষার পরে দেখা গিয়েছে তাদের ৬০ জনই করোনা আক্রান্ত। ব্যাঙ্গালুরুর এক ৬৭ বছরের বৃদ্ধা কুম্ভ থেকে ফিরেছেন 'সুপার স্প্রেডার' হয়ে। নিজের পরিবারের ১৮ জন সহ ৩৩ জনকে সংক্রমিত করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, গত বছর তবলিগি জামাতের কয়েকশো প্রতিনিধি একটি মসজিদে সম্মেলন করায় পুলিশ তাদের 'সুপার স্প্রেডার' তকমা দিয়ে গ্রেপ্তার করে। তা হলে কুম্ভে সরকার লাখ লাখ মানুষের জমায়েতে হতে দিয়ে করোনাকে দেশজুড়ে ছড়াতে সাহায্য করল কী করে? দেশের মানুষকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় প্রধানমন্ত্রী এড়াবেন কী করে?

স্বাভাবিকভাবেই আজ দেশ জুড়ে দাবি উঠছে, পিএম কেয়ার্স ফান্ডে যে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা হয়েছে তার হিসেব প্রকাশ্যে আনা হোক এবং অবিলম্বে তার সমস্ত টাকা কোভিড মোকাবিলায় খরচ করা হোক। প্রতিটি নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক। সরকার সেনা নামিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুক এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের পুঁজির পঞ্চাশ শতাংশ কোভিড মোকাবিলায় খরচ করতে বাধ্য করুক। দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত মানুষকে সারা বছর রেশনে বিনামূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে রেশন এবং নগদে সাহায্য দেওয়া হোক। দেশের মানুষের এই দাবিতে সরকার কান না দিলে দেশের মানুষকেই বাধ্য করতে হবে সরকারকে তা শুনতে।

গণআন্দোলনই বিকল্প

পাঁচের পাতার পর

করা। অন্যদিকে সিপিএম কংগ্রেস জোট বিজেপির প্রচারে শঙ্কিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটকে নিজেদের ঝুলিতে নেওয়ার চেষ্টায় চরম সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী আব্বাস সিদ্দিকির হাত ধরেছে। দুপক্ষেরই এই ভূমিকায় বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই যে মান্যতা পেয়ে যায়, এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে বিজেপির সুবিধা হয় তা এই সব দলের নেতৃত্ব বুঝতেই চাননি। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (সি) তুলে ধরেছে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা কেন খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থেই প্রয়োজন সেই কথা। তুলে ধরেছে সংগ্রামী বামপন্থার ঝাণ্ডাকে। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের মনীষীদের নাম আউড়ে তাঁদের শিক্ষার যে বিকৃতি বিজেপি ঘটাতে চাইছিল তার বিপরীতে এস ইউ সি আই (সি) তুলে ধরেছে নবজাগরণের প্রকৃত শিক্ষাকে। খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইটা যে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে একই, এই সত্য শুধু স্লোগানে নয়, এস ইউ সি আই (সি) তা তুলে ধরেছে একটানা চালিয়ে যাওয়া নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার দাবি, বিদ্যুতের দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোখার দাবি, তেল-গ্যাসের লাগামছাড়া দাম কমানোর দাবিতে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে এই দল। আশা কর্মীদের দাবি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি, পরিচারিকাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। একই সাথে ক্ষুদ্র-মাঝারি চাষি, খেতমজুর, গ্রাম এবং শহরের জব কার্ড হোল্ডার, যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লেখানো যুবক-যুবতীদের নিয়ে আন্দোলন করেছে এই দল। গণআন্দোলনই হল সেই শক্তি যা কার্যকরীভাবে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করতে পারে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে এই আন্দোলনকে এস ইউ সি আই (সি) নিছক কিছু নির্বাচনী সাফল্য জোগাড়ের লক্ষ্যে পরিচালিত করেনি। করেছে সংগ্রামী বামপন্থার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। আন্দোলনে যে মানুষগুলি এসেছেন, তাঁরা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির হিসাব কষার বদলে মর্যাদাময় জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখেছেন।

এই হল সেই শক্তি যার দ্বারা বিজেপির ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি, মানুষকে বিভক্ত করে রেখে একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সেবা করার রাজনীতিকে মোকাবিলা করা সম্ভব। বিজেপির সর্বনাশা রাজনীতিকে রোখার জন্য নির্বাচনে যে ভূমিকা পালন করেছে এস ইউ সি আই (সি) তাকে কেবলমাত্র ভোট সংখ্যা বা আসন সংখ্যা দিয়ে বোঝা যাবে না। যথার্থ বামপন্থার শক্তি হিসাবে তা প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে দেওয়াল তুলেছে। এই সংগ্রামী বামপন্থার রাজনীতিকে বাংলার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছেন। ভোটের নিরিখে কে হারবে কে জিতবে হিসাব কষে বিজেপিকে রোখার জন্য ভোটটা যারা তৃণমূলকেও দিয়েছেন, তাঁরাও অনেকে বলেছেন, সঠিক রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)। এই রাজনীতির শক্তি যত বাড়বে তত দুষ্ট রাজনীতিকে মোকাবিলা করার শক্তি বাড়বে।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার সরপি গ্রামের দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড শোভা গোস্বামী ৩ মে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। শেষে প্রায় একমাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

কমরেড শোভা গোস্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বদরদ্দোজা হাসপাতালে পৌঁছে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মরদেহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দুর্গাপুরের বাড়িতে পৌঁছলে এলাকার কর্মী-সমর্থক ও আত্মীয়-স্বজনরা বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে জেলা সম্পাদক, জেলা কমিটির সদস্যরা এবং তাঁর ছেলে-মেয়েরা সহ উপস্থিত সকলেই মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড শোভা গোস্বামী ছিলেন বর্ধমান জেলার প্রয়াত জননেতা কমরেড বিশ্বপ্রকাশ গোস্বামীর স্ত্রী এবং এই সুবাদে সংগঠন গড়ে ওঠার শুরু থেকেই ও পরবর্তী কালে বহু দুর্যোগ-ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথে তাঁকে যুঝতে হয়েছে। প্রথমে কংগ্রেস ও পরে সিপিএম রাজত্বে দীর্ঘ কয়েক বছর গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া, বারে বারে তাঁর স্বামীর উপর আক্রমণ, জেলে যাওয়া এবং তারপর স্বামীর অকালমৃত্যুর (৪২ বছর) মতো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই সন্তানদের বড় করে তোলা এবং তারা যাতে বাবার সংগ্রাম ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার পথ অনুসরণ করার মতো হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্য তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড গোপাল কুণ্ডু এবং ভাস্কর রায়চৌধুরীর অনুপ্রেরণামূলক সাহচর্য কমরেড শোভা গোস্বামীকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁদের বাড়িটি সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। পিছনেও মূলত কমরেড শোভা গোস্বামীর ভূমিকাই প্রধান।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দল ও নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আস্থা অটুট ছিল।

কমরেড শোভা গোস্বামী লাল সেলাম

অবিভক্ত বর্ধমান জেলার অন্যতম সংগঠক ও বর্ধমান শহর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড অশোক সরকার গত ২৯ এপ্রিল ৭২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ষাটের দশকে বর্ধমান শহর তথা অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড অশোক সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা পালন করেছেন তেমনই ভাষা শিক্ষা আন্দোলন, দৃষ্টিহীনদের জন্য 'গাংপুর নজরুল স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়' গঠন, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাট্যসংস্থা এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে সামনে রেখে 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ' গঠনে ও বিদ্যুৎ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কমরেড অশোক সরকার শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই দলের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। সহকর্মী, বিশেষ করে ছোটদের গুণের দিকগুলির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সকলের সাথেই তিনি খুব সহজভাবে মিশতে পারতেন। রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ-আচরণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির মূল সুরটিকে তিনি ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন পুরনো সংগঠককে হারালো।

কমরেড অশোক সরকার লাল সেলাম

কোভিড মোকাবিলায় সরকারি তৎপরতার দাবি রাজ্য জুড়ে

নদীয়া ঃ করোনা মোকাবিলায় দলের নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ মে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নানা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলি হল— রানাঘাট মহকুমায় ৩০০ বেডের একটি করোনা হাসপাতাল চালু করা, জেলায় ন্যূনতম করোনা বেডের সংখ্যা ১০০০ করা, প্রতিটি ব্লকে একটি করে সেফ হোম গড়ে তোলা, প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি করে অক্সিজেন বুথ তৈরি করা, এমার্জেন্সি রোগীদের জন্য প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা, অতি দ্রুত সমস্ত মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া, করোনা রোগীকে সেফ হোম আইসোলেশন সেন্টার কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগে বিনা ভাড়ায় অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ এবং ওষুধ ও অক্সিজেনের কালোবাজারি বন্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। স্মারকলিপি দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য হররোজ আলী শেখ, প্রবীর দে। তেহট্ট-২ নম্বর ব্লকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

আসানসোল ঃ ১০ মে, দলের আসানসোল লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কোভিড পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মানুষের পাশে সরকার এবং প্রশাসনকে অবিলম্বে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং দপ্তরের সম্মুখে কোভিড বিধি অনুসরণ করেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে সঞ্জয় চ্যাটার্জী কর্মসূচির নেতৃত্বদেন। কোভিড টেস্ট বাড়ানো, অক্সিজেন ও ওষুধ নিয়ে কালোবাজারি বন্ধ, সমস্ত ক্লাবগুলিতে ক্ষণস্থায়ী কোভিড কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং অতি দ্রুত ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। রাজ্যের সর্বত্র হিংসা বন্ধের দাবিও জানানো হয়।

কেশিয়াড়ি ঃ ১১ মে, কোভিড পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত টিকাকরণ, অক্সিজেন সরবরাহ, কেশিয়াড়ী ব্লকে পৃথক কোভিড হাসপাতাল তৈরি, ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধ সহ একাধিক দাবিতে কেশিয়াড়ী বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। অকাল বর্ষণের জেরে বোরো চাষে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, পঞ্চায়েত সমিতি দ্রুত গঠন, সরকারি উদ্যোগে লাভজনক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় সহ ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের দাবিও জানানো হয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বিডিও। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্নেহাশীষ আইচ, ঝাড়েশ্বর রাউৎ, ফটিক বেরা, শম্ভু গুড়িয়া, ডাক্তার সিং প্রমুখ।

কোলাঘাট ঃ করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় অবিলম্বে ব্লকের সংক্রমিত এলাকায় বাড়িতে গিয়ে ব্যাপক করোনা টেস্ট, কোলাঘাট গ্রামীণ হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসা, ব্লকে আইসোলেশন সেন্টার বাড়ানো, দ্রুত সবাইকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া, সরকারি ব্যবস্থাপনায় রোগী পরিবহণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিভৃতাবাসে রাখার বন্দোবস্ত ও খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি তেরো দফা দাবিতে ১১ মে দলের কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল বিডিও-কে স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, শংকর মালাকার, প্রশান্ত পড়িয়া, অর্জুন ঘোড়াই প্রমুখ। বিডিও দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বিধাননগর ঃ ১৩ মে, দলের বিধাননগর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বিধানগরের এসডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুই সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড জয়ন্ত জানা ও দিলীপ দাশ অধিকারী। এসডিও-র কাছে প্রতিনিধি দল দাবি জানান বিধাননগর এলাকায় কোভিড মোকাবিলার দায়িত্ব বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়ার বদলে সরকারি পরিকাঠামো বাড়াতে হবে, সরকারি টেস্টিং সেন্টার খুলতে হবে, ভ্যাক্সিন বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। তাঁরা বিধাননগর এলাকায় কোভিডে মৃতদের সৎকারে উপযুক্ত এবং সম্মানজনক ব্যবস্থার দাবি জানান। এসডিও সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

কলকাতার ১৬ নং বরোয় ডেপুটেশন

বড়িশা সরশুনা ঃ ১৭ মে, কলকাতার বড়িশা সরশুনা এলাকায় দলের লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা পৌরসভার ১৬ নম্বর বরোতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরাতার দাবি জানায় প্রতিনিধি দল।

কলকাতা পৌরসভার প্রায় সমস্ত বরোতেই অনলাইনে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও জলপাইগুড়ি শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত কোভিড আক্রান্ত হয়ে ২ মে সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি প্রথমে শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে এবং পরে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জেলার সকল পার্টি কর্মী, সমর্থক, দরদি সহ তার পরিচিত সকল মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কিশোর বয়সেই কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত তাঁর বাবাকে হারান বিমান দুর্ঘটনায়। পাঁচ সন্তান নিয়ে তাঁর মা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাঁদের বড় করেন। কলেজ জীবনে নকশালপন্থী রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তাঁর কিশোর বয়সের বন্ধু, দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী তাঁকে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন বই পড়তে দিতেন। উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধ থাকলেও দৃঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যুক্তিপূর্ণ কথা গ্রহণ করার মানসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল।

কলেজ জীবন শেষ করে সংসারের প্রয়োজনে তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি গ্রহণ করে আসামের শিলচরে যান। সেই সময় দলের বর্তমান পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য আসামের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। কমরেড দত্তগুপ্ত তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের আলোচনা ও জীবন তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে তিনি দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং আর পিছন ফিরে তাকাননি।

চাকরির সূত্রেই তিনি কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে আসতেন। কাজের ফাঁকে তিনি দুটি জেলাতেই পার্টি কর্মীদের সাথে দলের একজন হয়ে বন্ধুর মতো মিশতেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংগ্রহণ করতেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তিনি সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন।

কয়েক বছর পর তিনি মা, স্ত্রী, শিশু কন্যা ও পুত্রকে নিয়ে স্থায়ী ভাবে জলপাইগুড়িতে থাকতে শুরু করেন। এখানে তিনি চাকরি করার পাশাপাশি দলের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত করেন এবং দলের সাথে নিজেকে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য মনোনীত হন। মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বন্ধু বান্ধব সবার মধ্যে পার্টি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর সাহচর্যে তাঁর স্ত্রী দলের কর্মী হয়ে ওঠেন।

পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী মার্কসবাদী দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা সহ সকল বিষয়ে তার জানার আগ্রহ ছিল প্রবল এবং উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল। দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময় তিনি বিভিন্ন কারণে চাকরি ছেড়ে দেন। রামঝোরা চা বাগান যখন লক আউট হয়, তখন দিনের পর দিন তিনি শ্রমিক বস্তিতে থেকে একদিকে যেমন আন্দোলন পরিচালনা করেছেন আবার অভাবগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করেছেন।

নিজ সংসারে আর্থিক দুর্দশায় সন্তানদের কষ্ট দেখে তিনি টিউশন করতে শুরু করেন ও পরে পার্টির পরামর্শে আইন পাশ করে ওকালতি করেন। এই সময় পার্টির কাজ নিয়মিত করতে না পারার কারণে তিনি নিজেই প্রস্তাব দেন যে, তাঁর জেলা কমিটির সদস্য পদে থাকা উচিত নয়। জেলা কমিটির সদস্য পদে না থাকা সত্ত্বেও উন্নত রুচির পরিচয় দিয়ে তিনি সময় পেলেই দ্বিধাহীন চিত্তে পার্টির কাজে ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে এগিয়ে আসেন এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।

সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দরদ বোধ। সেই বোধ থেকেই তিনি নতুন করে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পুনরায় তিনি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্টি তাঁকে শহর লোকাল কমিটির দায়িত্ব দিলে হাসিমুখে সে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। করোনা মহামারির মধ্যেও আগামী দিনে জনজীবনের সর্বনাশের কথা মানুষকে বোঝাতে তিনি ছুটে গেছেন বারবার। যখন তা পারতেন না, ব্যথায় ছটফট করতেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পার্টির দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

বয়সে কিংবা অভিজ্ঞতায় অনেক ছোটদের সঠিক কথা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে তাঁর কখনও বাধেনি। পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য, জীবনে পার্টির নির্দেশ হাসিমুখে গ্রহণ, কর্মীদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহশীল মন এ রকম বেশকিছু মূল্যবান গুণের অধিকারী ছিলেন কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল তার এক সংগ্রামী সাথীকে।

কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত লাল সেলাম

কোভিড নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিবাদ এআইএমএসএস-এর

৮ মে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির ডাকে কোভিড দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিবাদে সারা দেশের ২১টি রাজ্যে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচি পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৫০০০ জন সহ সারা দেশে প্রায় ২৫০০০ মহিলা দাবি সংবলিত পোস্টার হাতে নিয়ে অনলাইনে প্রতিবাদ করেন। ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবরাহ ও ভ্যাকসিন প্রদান, বিনামূল্যে কোভিড পরীক্ষা ও আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ ৮ দফা দাবি জানিয়ে এ দিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনলাইনে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ছবি মোহান্তি।

মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাঙ্ককর্মীদের স্মারকলিপি

করোনা অতিমারির বর্তমান আবহে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক পরিষেবাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে ব্যাঙ্ককর্মীদের দফতরে যেতে হচ্ছে। কোভিড প্রতিরোধে লোকাল ট্রেন, মেট্রো রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং রাস্তায় বাসের সংখ্যা অর্ধেক করে দেওয়ায় সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা, যাঁরা দূরবর্তী জায়গা থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে বা এটিএম-এ যাতায়াত করে পরিষেবা দেন। এর ফলে ভিড়ে ঠাসা যানবাহনে সবাইকে বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে নিম্নলিখিত আবেদন জানানো হয়েছে, ১) অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবায় যুক্ত কর্মীদের কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য যেন পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিশেষ ট্রেন চালানো হয়, ২) রেলকর্মীদের জন্য যে বিশেষ ট্রেন চলছে তাতে যেন ব্যাঙ্ককর্মী সহ এ ধরনের কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়, ৩) এই অতিমারির আবহে যাঁরা সামনের সারিতে থেকে জনসাধারণের সাথে মিশে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা দিচ্ছেন, সেই সব কর্মীদের যেন সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য এবং জীবনবিমার আওতায় আনা হয়।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে

পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ গ্রামীণ নন-রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারদের সংগঠন পিএমপিএআই-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি এবং রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের করোনা সংক্রমণের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গ্রামের নন-রেজিস্টার্ড প্র্যাক্টিশনারদের অবিলম্বে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিযুক্তির ঘোষণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। এই সংগঠন ১৯৮২ সালে জন্মলগ্ন থেকেই এই প্র্যাক্টিশনারদের বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে। ২০২০ সালে সারা দেশের হাসপাতালে নন-কোভিড রোগীর সাধারণ চিকিৎসা যখন প্রায় বন্ধ ছিল, পাশ করা ডাক্তার ছিল কার্যত অমিল, তখন এই গ্রামীণ চিকিৎসকেরাই ফ্রন্টলাইনযোদ্ধার ভূমিকা পালন করে সারা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন এমনকি কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাগুলির সিএমওএইচ সহ স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এবং স্বাস্থ্য সচিবের কাছে গ্রামীণ প্র্যাক্টিশনারদের ন্যূনতম কোভিড সুরক্ষা হিসাবে মাস্ক, হ্যাণ্ড গ্লাভস, স্যানিটাইজার দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিকিৎসকদের কাজে নিয়োজিত করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সামাজিক সুরক্ষার দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কেরালায় বামপন্থার জয় নয়

চারের পাতার পর

মানুষকে দুঃখের হলেও একটি কঠিন বাস্তব সত্য স্বীকার করতে হবে, তা হল, কেরালাবাসী দীর্ঘদিন ধরে গৌরবের সঙ্গে যে বামপন্থী মানসিকতার চর্চা করে এসেছে, লালন করেছে, তা আজ অনেকখানি দুর্বল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বাড়তে থাকা প্রভাব, সামাজিক পরিবেশে বিজ্ঞান চেতনা এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ভাবনার অভাব, গণতান্ত্রিক সহনশীলতা কমে যাওয়া, চূড়ান্ত সুবিধাবাদের ব্যাপক প্রসার, সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দ্বিধায় যে কোনও ধরনের হীন কাজে যুক্ত হওয়ার অনৈতিক রাজনীতি, অধিকার আদায়ে সাহসের সঙ্গে লড়াই করার বদলে কর্তৃপক্ষের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি ও দাসত্বের মনোভাব, এই সমস্ত কিছুই সমাজে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার জমি তৈরি করবে। বিজয় উৎসব এবং নতুন সরকারের কাছে আমাদের আশা ব্যক্ত করার মাঝে এই ঐতিহাসিক শিক্ষাটি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তাই, সচেতন চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে বাম মানসিকতা পুনরুদ্ধারের কঠোর সংগ্রামে আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত। বাম রাজনীতির সঠিক পথ হল, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। গণআন্দোলন গড়ে তোলার এই রাজনীতিকে সর্বশক্তি দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরাই এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শাসকের শত চেষ্টাতেও ধ্বংস হয়নি মানবতা

দেশে আজ চারিদিকে আর্তনাদ— অক্সিজেন নেই, হাসপাতালে বেড নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, চিকিৎসার সুযোগ মিলছে না। মৃত্যু মিছিলে শ্মশান-কবরস্থানগুলি ভরে যাচ্ছে। পোড়ানোর কাঠ নেই, কবর দেওয়ার স্থান সংকুলান হচ্ছে না। শয়ে শয়ে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গায়। শকুন, কাক, কুকুরে টেনে খাচ্ছে। এই গভীর অন্ধকারে শাসকরা যখন হাত গুটিয়েছে, আশার আলো দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এমনই আলোর সাক্ষী হল এই পশ্চিমবঙ্গেরই হুগলির দাদপুর। করোনা আবহে বাবার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে যখন নিজের আত্মীয় স্বজনদের পাশে পাচ্ছিলেন না মৃত হরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁর ছেলে চন্দন। তখন এগিয়ে এসেছেন গোলাম সুব্বানি, আশিকেরা। দিনটা ছিল খুশির ইদের। কিন্তু প্রতিবেশীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আনন্দে মাতার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন এলাকার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। তাঁরাই করেছেন হরেন্দ্রনাথের দাহকাজ। প্রচার চাননি তাঁরা। বলেছেন, এটাই তো মানুষের কাজ, এটাই তো মানুষের ধর্ম— একের বিপদে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। ঠিক এমন করেই মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে ওই জালাল মোল্লাদের মধ্যে। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের মৃতদেহ শ্মশানে-কবরে পৌঁছে দিয়ে সৎকারের কাজে সাহায্য করে চলেছেন যিনি। ব্রিটিশদের মতোই স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশের শাসকরাও কম চেষ্টা করেনি মেহনতি মানুষের ঐক্য ভাঙতে, সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়াতে। কিন্তু মানুষের প্রথম পরিচয় তার মানবধর্ম, সে ধর্ম যে এত সহজে ধ্বংস হয় না, সেই পরিচয় পাওয়া শুধু এই দুটি ঘটনায় নয়, পাওয়া যায় দেশজুড়েই। যেমন, কাশ্মিরী পণ্ডিত মাখনলাল দীর্ঘদিন শ্রীনগরের বাসিন্দা। তাঁর মৃত্যুতে ধর্মে মুসলিম প্রতিবেশীরা অন্ত্যেষ্টির সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। একই ছবি দেখা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশেও। আবার এ রাজ্যে রমজানের উপবাসের মধ্যেও ঝাড়গ্রামে গোপাল রাউত, অমর পালদের সাথে কবীর মুন্সী, শেখ নাসিরউদ্দিনদের দেখা যায় একসাথে বাড়ি বাড়ি ওষুধ, খাবার পৌঁছে দিতে। এ চিত্র গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে।

এ গেল সাধারণ মানুষের কথা। কিন্তু হিন্দুত্বের স্বঘোষিত ঠিকাদার বিজেপি আরএএস-এর ক্ষেত্রেও কি সত্যটা একই? না। তাঁরা যে এমন মানবতার ধার ধারেন না, ধর্মের পরিবর্তে তাদের হাতিয়ার যে শুধুই সাম্প্রদায়িকতা তার প্রমাণ তারা দিয়ে চলেছেন। ধর্মীয় পরিচয় তুলে, বিদ্বেষের রাজনীতি করছেন তারা এই সংক্রমণের দুঃসময়েও।— গুজরাটের ভদোদরা তার সাক্ষী। দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শ্মশানের কাঠ সরবরাহ করছিলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরা। কিন্তু বাধা দিয়েছেন শাসক বিজেপির নেতারা। গুজরাটের ভদোদরায় বিজেপি সভাপতি বিজয় শাহ আপত্তি তুলে বলেছেন হিন্দু ধর্মের সৎকার সম্পর্কে মুসলিমদের কী জ্ঞান আছে, তাই ওদের শ্মশানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না (ইন্ডিয়া টাইমস,১৯ এপ্রিল,২০২১)। সর্বত্রই সাধারণ মানুষের বিপরীতে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি-আরএসএসের ভূমিকা। মনে পড়ে যায় কবিতার সেই লাইনগুলো... 'আমার ঘরের বাঁয়ে থাকেন রাখহরি, ডানদিকের পড়শি আমার আল্লারাখা। কেউ বলতো একই বৃন্তে দুটি কুসুম, কেউ বলতো একই গাছের দুটি শাখা.....।' এই হল সাধারণ মানুষের কথা। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই দেশ অতীতেও বহু বিপর্যয়ে ও বিপন্নতায় এমন সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের সাক্ষী থেকেছে।

মানুষের কামনা, দেশের শাসকরা যতই মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দিতে চাক, বিভেদের বেড়ায় আটকাতে চাক সেখানেই যেন রুখে দাঁড়াতে পারে মানবতা। শাসকের ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতি রুখতে এমন করেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুক আশিক, চন্দন, গোলামরা। এ চলা আটকায় এমন সাধ্য কোন শাসকের?

মাধ্যমিক ঃ সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করুক সরকার

দাবি তুলল এআইডিএসও

কোভিড অতিমারির এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি কিংবা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধি ও অতিমারি বিশেষজ্ঞদের মতামত আহ্বান করেনি। শুধুমাত্র ১ জুন থেকে এই পরীক্ষা হচ্ছে না সেটাই জানানো হয়েছে। ফলে এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। এই সংক্রমণের মধ্যে পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়ে কবে হবে বা কীভাবে নেওয়া হবে, আদৌ পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না, না হলে এবার মূল্যায়নই বা কী পদ্ধতিতে হবে— এমন নানা অনিশ্চয়তা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে কাজ করছে। এমনিতেই কোভিড অতিমারির এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বহু পরীক্ষার্থী স্বজন হারানোর ব্যথায় ব্যথিত। বহু পরীক্ষার্থীর পরিবার তাদের প্রিয়জনের চিকিৎসার জন্য বেহাল এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অব্যবস্থায় দিশেহারা। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে বহু পরিবার জেরবার। তা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও অনেক যন্ত্রণার মধ্যে পরীক্ষার্থীরা দিন কাটাচ্ছে। এই অবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতার অভাব লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১০ মে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং সমস্ত জেলায় জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধি ও অতিমারি বিশেষজ্ঞদের মতামত আহ্বান করা হোক এবং অবিলম্বে সরকারি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দ্রুত ঘোষণা করা হোক।

ভ্যাক্সিনের দায় নিল না সরকার, দেশের মানুষকে ঠেলে দিল বেসরকারি কোম্পানির গ্রাসে

করোনা অতিমারিতে যখন প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন, চিকিৎসা ও অক্সিজেনের অভাবে হাজার হাজার মানুষ তিল তিল করে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে, তখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই পরিস্থিতি অনেকখানি সামাল দিতে পারত ভ্যাক্সিন। এই অবস্থায় যখন জরুরি প্রয়োজন ছিল সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং পূর্ণ দায়িত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন সংস্থা, এমনকি বেসরকারি নানা ফার্মা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তাদের অর্থসাহায্য দিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভ্যাক্সিন উৎপাদন করা, তখন তা না করে প্রধানত একটি বেসরকারি কোম্পানিকেই উৎপাদনের দায়িত্ব দিয়ে সরকার চুপচাপ বসে থাকল। প্রয়োজন ছিল ভ্যাক্সিন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা, যাতে কালোবাজারি না হয়। সেগুলির কোনওটাই সরকার করল না। এমনকি দেশের মাত্র তিন শতাংশ মানুষ ভ্যাক্সিন পেলেও বাকিটা বিদেশে রপ্তানি করে দিতে দ্বিধা করল না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

কোলাঘাট ব্লক অফিসে সবার জন্য ভ্যাক্সিনের দাবিতে ডেপুটেশন। ১১ মে

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম নিয়ামক সংস্থা অনুমোদিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ১৫৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে দেশে। রয়েছে ভ্যাক্সিন উৎপাদক সাতটি বড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা— হিমাচল প্রদেশের দ্য সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, তামিলনাড়ুর বিসিজি ভ্যাক্সিন ল্যাবরেটরি, পাস্তুর ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, আর এইচ এল এল বায়োটেক, উত্তরপ্রদেশের ভারত ইমিউনোলজিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড, মহারাষ্ট্রের হ্যাফকিন বায়ো-ফার্মাসিউটিকালস এবং তেলেঙ্গানার হিউম্যানস বায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। এগুলিকে গত কয়েক বছর ধরে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। সদিচ্ছা থাকলে এই সংস্থাগুলিকে উজ্জীবিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্যাক্সিন সরকার উৎপাদন করতে পারত। ভারত বায়োটেকের মতো বহুদিনের বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। আইসিএমআর-এর সাথে ভারত বায়োটেকের যৌথ উদ্যোগে কো-ভ্যাক্সিন উৎপন্ন হয়েছে, তার প্রয়োগও হয়েছে সফলতার সাথে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সেই ভ্যাক্সিন উধাও। অতিমারিতে মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাক্সিন জোগাতে চাইলে সরকার এই সমস্ত সংস্থাকে দিয়ে ভ্যাক্সিন উৎপাদন করাতে পারত। তাদের আর্থিক সাহায্য করতে পারত। তা না করে বেসরকারি সংস্থা আদার পুনেওয়ালার সিরাম ইনস্টিটিউটকে ভ্যাক্সিন তৈরির একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দিল সরকার। যার সুযোগ নিয়ে এই কোম্পানি ভ্যাক্সিন নিয়ে ব্যাপক মুনাফা শিকারে নেমে পড়েছে।

গত বছর করোনার প্রথম ঢেউয়ের পর হাতে বেশ কয়েক মাস সময় পেয়েও সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজানোর কোনও ব্যবস্থাই করেনি। বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো, চিকিৎসা-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, উপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, অক্সিজেনের উৎপাদন বাড়ানো, সকলের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি থেকে টিকা কেনা ইত্যাদি কিছুই করেনি। এখন দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশ যখন টালমাটাল, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কার্যত পাশ কাটিয়ে বেসরকারি সংস্থার মালিক ধনকুবেরদের বিপুল মুনাফা করার সুযোগ করে দিল সরকার। ভ্যাক্সিনের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারের এই বৈষম্য নীতি বারে বারে সামনে এসেছে। ভারত বায়োটেক এবং আইসিএমআর যৌথভাবে দেশের মানুষকে চিকিৎসা সরঞ্জাম জোগানোর প্রাণপণ চেষ্টায় যখন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হচ্ছে, তখন সরকার সাহায্য করা তো দূরের কথা, দুয়োরানির মতো মার্চ মাসে তাদের মাত্র ৪০ মিলিয়ন এবং পরে আর ৫০ মিলিয়ন ভ্যাক্সিনের অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু সিরাম ইনস্টিটিউটকে ২৬০ মিলিয়ন ভ্যাক্সিন তৈরির বরাত দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরো ভ্যাক্সিন উৎপাদনকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রক্রিয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। তার সুযোগ নিয়ে সিরাম ইনস্টিটিউট ৯০ শতাংশ ভ্যাক্সিন (কোভিশিল্ড) তৈরি করে বাজারে ফাটকা খেলতে নেমে পড়েছে। এর শিকার হচ্ছেন দেশের আপামর জনসাধারণ। যে জীবনদায়ী ভ্যাক্সিন বিনামূল্যে দেওয়ার কথা, তা সরকারের অপদার্থতায় বেসরকারি মালিকের মুনাফার পণ্যে পরিণত হয়েছে। এমনিতেই সিরাম ইনস্টিটিউট কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ১৫০ টাকা, রাজ্য সরকারের জন্য ৩০০ টাকা এবং বেসরকারি হাসপাতালের জন্য ৬০০ টাকা দাম ধার্য করেছে। এখন উৎপাদনের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রতি ডোজ ৬০০ টাকায় এবং বেসরকারি হাসপাতালকে ১২০০ টাকায় কিনতে বাধ্য করছে সিরাম ইনস্টিটিউট। ৪৫ বছরের বেশি বয়সীরা অনেকেই প্রথম ডোজ নেওয়ার পর চাতকের মতো দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে তিন থেকে চার মাসের আগে কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে না। ফলে তাদের ভ্যাক্সিন পেতে পেতে হয়ত বছর ঘুরে যাবে, যখন করোনার প্রকোপে সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। এ ছাড়া সরকার ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের ভ্যাক্সিন দেওয়ার দায় থেকে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নেওয়ায় যুব প্রজন্মের কোনও সুরক্ষাই রইল না।

সরকার কি জানত না বেসরকারি মালিকরা, ধনকুবেররা ভ্যাক্সিন নিয়ে ব্যবসা করবে, মুনাফার পাহাড় বাড়াতে মানুষের জীবনকে পুঁজি করবে? তা সত্ত্বেও তাদের হাতে তুলে দিল কেন ১৩৮ কোটি মানুষের ভবিষ্যত? কেন বেসরকারি কোম্পানির দিকেই হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকতে হবে দেশবাসীকে? যেখানে প্রয়োজন ছিল সরকারি উদ্যোগে দ্রুত সব মানুষের কাছে ভ্যাক্সিন পৌঁছে দেওয়া সেখানে শুধুমাত্র একটি বেসরকারি সংস্থার উপর সবটা ছেড়ে দিয়ে আসলে প্রধানমন্ত্রী একটি কোম্পানিকেই বিপুল মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিয়েছেন। যেভাবে নানা ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মদত দেওয়ার নীতি নিয়ে চলেছে, আম্বানি-আদানিদের মতো সিরামও তেমন একটি কোম্পানি। এইভাবেই একচেটিয়া পুঁজির পছন্দের নেতা, পছন্দের দল এবং পছন্দের সরকার হিসাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় নরেন্দ্র মোদি এবং তার দল বিজেপি।

পুঁজিবাদী 'সভ্যতা' কতটা নিচে নামতে পারলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সময়ও জীবনদায়ী ভ্যাক্সিন নিয়ে কালোবাজারি করতে পারে, তাকে মুনাফার পণ্যে পরিণত করতে পারে— বর্তমান করোনা মহামারি তা দেখিয়ে দিল। কিন্তু জনসাধারণ কি নীরব দর্শক হয়ে লাশের সংখ্যা গুনবে, আর হা-হুতাশ করবে? নাকি এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে আলোর ভোরের সন্ধান করবে? বিনামূল্যে সকলের জন্য অক্সিজেন, টিকা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের দাবিকে জোরদার করাই আশু কর্তব্য প্রতিটি মানুষের। দাবি তুলতে হবে দেশের সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই। মানুষের মৃত্যু রুখতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানুষের মতো আচরণ করতে হবে।

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ব্যাঙ্ক

করোনা দেশ জুড়ে মহামারির আকার ধারণ করেছে, কাজ হারাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তখন নতুন করে সারা দেশে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের ফলে অথবা স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় ২১১৮টি শাখা। এদিন এক বিস্ময়কর তথ্য সামনে নিয়ে এলেন মধ্যপ্রদেশের অ্যাক্টিভিস্ট চন্দ্রশেখর গৌড়। আরটিআই-এ তাঁর প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১০টি সরকারি ব্যাঙ্কের ২১১৮টি শাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ১২৮৩ টি শাখা বন্ধ হয়েছে। অন্য দিকে সংযুক্তিকরণের জেরে ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৩৩২ শাখা বন্ধ হয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৬৯টি, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ১২৪টি, কানাড়া ব্যাঙ্কের ১০৭টি, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কের ৫৩টি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৪৩টি, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ৫টি, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের ৫টি এবং পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের একটি করে শাখা বন্ধ হয়েছে (সূত্রঃ নিউজফাইন্ডার ডট ইন, ৯.৫.২১)।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৩০ আগস্ট ২০১৯ ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তি ঘটিয়ে সংখ্যাটা চারে নামিয়ে আনা হয়েছিল। এর ফলে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৮ থেকে কমে দাঁড়ায় ১২-তে।

কর্পোরেট মালিকরা ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ আত্মসাৎ করার ফলেই ব্যাঙ্কগুলি অনুৎপাদক সম্পদের বোঝায় ধুঁকছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা আদায় না করে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির অজুহাতে এই সংযুক্তি ঘটিয়েছে। বাস্তবে কর্পোরেট মালিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় না করে সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্মচারী, আমানতকারী সাধারণ মানুষের উপর। মোদি সরকারের এফআরডিআই বিল কার্যকর করার পিছনে উদ্দেশ্যই ছিল ঋণ নেবে ধনকুবেররা, শোধ করবে জনগণ।

প্রশ্ন উঠছে, শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণে রুগ্ন ব্যাঙ্কের বোঝা মানুষ বইবে কেন? অনাদায়ী ঋণের পাহাড় কি সরকারের ব্যাঙ্কনীতির ব্যর্থতা নয়? ব্যাঙ্ক লাভ করলেও আমানতকারীদের ভাঁড়ার শূন্য। ব্যাঙ্কের ক্ষতির বোঝা তবে সাধারণ সঞ্চয়ীদের কেন বহন করতে হবে? মানুষকে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে সরকারের কি দায় নেই?

দেশের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে ব্যাঙ্কের শাখা বাড়ানোর দরকার ছিল। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের ফলে ব্যাঙ্কগুলির বহু শাখা বন্ধ হয়ে অসংখ্য কর্মচারী কাজ হারাবেন সাথে সাথে সেই শূন্য পদে আর নতুন করে নিয়োগ হবে না। এত দিন গ্রাহকরা সুদের হার বা পরিষেবার মাশুল বিচার করে পছন্দ মতো ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়ার যে সুযোগ পেতেন, তা সঙ্কুচিত করা হল। আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা বা সঞ্চয় ব্যাঙ্কে কতটা নিরাপদ, এই নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই আজ সরকারের এই সিদ্ধান্ত। ব্যাঙ্কক্ষেত্রে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যাঙ্ক-কর্মচারী এবং আমানতকারীদের যুক্তসমিতি গঠন করেক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিজেপি শাসনে আজ মৃত্যু-রাজ্য উত্তরপ্রদেশ

শত শত মানুষের লাশ বয়ে চলেছে গঙ্গা, বয়ে চলেছে যমুনা। শুধু সহস্র নিরন্ন অসহায় মানুষের হাহাকার নয় শত শত লাশের ভারও আজ বইতে হচ্ছে তাদের।

উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা তীরের মানুষ সম্মুখীন এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার। প্রতিদিন তাঁদের গ্রামে, শহরে গঙ্গার ঘাটে, মাঝ নদীর চড়ায় এসে ঠেকছে শত শত মানুষের মৃতদেহ। বালির চড়ায় পুঁতে দেওয়া হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ জল বাড়লেই ভেসে উঠছে। কুকুর, শিয়াল, কাকে ঠুকরে খাচ্ছে সেই দেহ। এ যদি নরক না হয়, নরক তবে কোনটা? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বারাণসীতে দাঁড়িয়ে তাঁর হিন্দুত্ব আর গঙ্গা প্রেমের বড়াই করেন, সেই বারাণসীর ঘাটেও ভেসে চলেছে লাশ। যে লাশ ভেসে বিহার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এঁদের বেশিরভাগই করোনা রোগে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কেন এই হতভাগ্য মৃতদের সম্মানজনক শেষকৃত্যটুকুও হল না? এই মর্মান্তিক পরিণতিই কি দেশের নাগরিক হিসাবে পাওনা ছিল তাঁদের? অবশ্য যে দেশে সরকার কোনও গণতন্ত্রের ধার ধারে না, যে দেশের শাসক দলগুলি জানে, জনস্বার্থের কোনও তোয়াক্কা না করলেও চলে— একচেটিয়া মালিকদের সেবার বিনিময়ে পাওয়া টাকার থলির জোর আর ধর্ম-জাতপাতের বিদ্বেষের জিগির তুললেই গদিলাভ নিশ্চিত, সে দেশে মানুষের এই দুর্দশা হবে না কেন! আজ বিজেপি সরকার চাইছে কোভিড আক্রান্ত এবং মৃত মানুষের পরিসংখ্যান চেপে দিতে। কারণ সারা উত্তরপ্রদেশে চিকিৎসা পরিকাঠামো, অক্সিজেন, ওষুধের অভাব চরম জায়গায়। গত ১২ মে ইন্ডিয়া টু ডে-র একটি সংবাদ তারই সামান্য একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছে। গ্রেটার নয়ডা গ্রামের আতর সিং তাঁর এক পুত্রকে শ্মশানে দাহ করে এসে দেখেছেন ততক্ষণে আর এক পুত্রও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ২৮ এপ্রিল থেকে ১১ মে-র মধ্যে ওই গ্রামে ১৮ জন কোভিড লক্ষণযুক্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অথচ কারও কোভিড টেস্ট হয়নি। কারণ কাছাকাছি কোভিড পরীক্ষার কোনও সরকারি ব্যবস্থা নেই। যা আছে তার সুযোগ নেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই। এই নয়ডাকেই এক সময় উন্নয়নের প্রতিরূপ বলে তুলে ধরেছিল সরকার। দিল্লির উপকণ্ঠে নয়ডার অবস্থাই দেখিয়ে দিচ্ছে সারা উত্তরপ্রদেশে চিকিৎসার হাল কোথায় দাঁড়িয়ে!

সংবাদমাধ্যমে যতটুকু খবর বেরিয়ে আসছে সেটাই ভয়াবহ। বাস্তব চিত্রটা যে আরও ভয়াবহ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসা নেই, অক্সিজেন নেই, ওষুধ নেই, হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড নেই— এই নেই রাজ্য নিয়েই চলছে উত্তরপ্রদেশের কোভিড ব্যবস্থাপনা। সাধারণ মানুষ শুধু নয় বিজেপির নেতা এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষকুমার গঙ্গোয়ার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখে বলছেন, ভেন্টিলেটর থেকে ওষুধ সব কিছু নিয়ে কালোবাজারি চলছে। একাধিক বিজেপি বিধায়ক চিঠি লিখেছেন, তাঁদের পরিজনরা পর্যন্ত কীভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন, বেড পাননি এই সব নিয়ে। বিজেপির একজন বিধায়কও করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার বদলে বিজেপি সরকার ব্যস্ত সরকারের সমালোচনার গলা টিপে ধরার কাজে। প্রাক্তন আইএএস অফিসার সূরজ কুমার সিংহ সরকারের খামতি তুলে ধরে টুইট করায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে পুলিশ। এর আগে দাদুর জন্য অক্সিজেন চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আকুল আবেদন জানানো যুবকের বিরুদ্ধেও এফআইআর করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে মৃতের সংখ্যা চাপা দিতে সরকারি তত্ত্বাবধানেই অনেক করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। লন্ডনের দ্য টেলিগ্রাফ, এশিয়া নিউজের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও বলা হয়েছে বহু ক্ষেত্রে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালকরাই নদীতে দেহ ফেলছেন (দ্য টেলিগ্রাফ, এশিয়া নিউজ ১১ মে,২১)। আরও কিছু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একেকটা এলাকায় এত বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটছে যে, শ্মশানঘাট, কবরস্থানে জায়গা নেই। শ্মশানে দাহ করার জন্য ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে। ফলে মৃতের নিরুপায় স্বজনেরা দেহ কোনও রকমে একটু আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিচ্ছেন গঙ্গার জলে। না হয় পুঁতে দিয়ে আসছেন নদীর তীরের বালিতে। পরে জলের ধাক্কায় সেই দেহ বেরিয়ে আসছে।

বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতোই করোনা সংক্রমণ বাড়ার সময়টাতেই দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভোট নিয়ে এতটাই 'ব্যস্ত' ছিলেন যে, নিজের রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে পারেননি। এর আগেও তিনি ব্যস্ত ছিলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, গো-রক্ষার নামে নরহত্যায় ইন্ধন দেওয়া ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে। কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েত হতে দিয়ে সুপার স্প্রেডারের দায়িত্ব বিজেপি নেতারাই পালন করেছেন। একই সাথে শত শত বাইরের লোককে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে করোনা ছড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে যোগী আদিত্যনাথজি। দেশের অধিকাংশ মানুষকে টিকা দেওয়ার কোনও দায় নেবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর বিলাসবহুল বাসভবন সহ সেন্ট্রাল ভিস্টার ২০ হাজার কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রীর বিমান কিনতে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা খরচ করতে তাদের অসুবিধা নেই। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার সেই পথেই হেঁটে চিকিৎসার উপরে ঠাঁই দিয়েছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের হেনস্থা করার কাজকে। মানবদরদী চিকিৎসক কাফিল খান, সরকারের সমালোচক সাংবাদিক, হাথরসে কিশোরীকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে যাওয়া সাংবাদিক সহ সমস্ত সমালোচকের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহের মামলা দেওয়ার কাজই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ভেবেছিলেন সরকারের সমালোচনা বন্ধ হলেই সব ছিদ্র বন্ধ করে তাঁরা সুখে রাজত্ব করবেন। উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে সরকারের বিপদ এড়ানোর এই হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখে একাধিকবার দিল্লি হাইকোর্ট, লক্ষ্ণৌ হাইকোর্ট, বোম্বে হাইকোর্ট, মাদ্রাজ হাইকোর্ট এমনকি সুপ্রিম কোর্টও তীব্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু সরকারের কানে জল ঢোকেনি।

শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকার নয়, বিজেপি পরিচালিত মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, কর্ণাটক সরকারও একই রকমের অপদার্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। অবশ্য বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান নেতা নরেন্দ্র মোদি কোভিডের টিকা থেকে শুরু করে অক্সিজেনের ব্যবস্থা, টেস্ট করার কেন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে যে চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন, আদিত্যনাথরা সেই পথই অনুসরণ করে চলেছেন। এখন বিজেপি ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদি সাহেবের ইমেজ যেন টোল না খায় তা দেখার কাজে। দেশের মানুষ মরুক, মোদি সাহেবের ভাবমূর্তি অটুট থাকলেই হবে।

এত বড় অপরাধমূলক কাজ যারা করে চলেছে দেশের মানুষ তাদের ক্ষমা করতে পারে না। একই সাথে বলতে হয়, এটাই আজ সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল চিত্র। মানুষের ন্যূনতম মর্যাদা এই ব্যবস্থার কাণ্ডারিদের কাছে নেই। নরেন্দ্র মোদি, যোগী আদিত্যনাথরা তারই প্রতিনিধিত্ব করছেন।

দায়ী মোদি সরকার
বলল ল্যানসেট

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেডিক্যাল জার্নাল 'দি ল্যানসেট' ৮ মে তার সম্পাদকীয়তে আশঙ্কা প্রকাশ করে জানাল, ১ আগস্টের মধ্যে ভারতে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছুঁতে পারে। গত ১২ মে স্বাস্থ্যদপ্তরের ঘোষিত কোভিড মৃত্যুসংখ্যা ২,৫৪,১৯৭। তার মানে আগামী আড়াই মাসের মধ্যেই তা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০ লক্ষে পৌঁছবে।

ল্যানসেটের এই আশঙ্কার ভিত্তি হল 'দ্য ইন্সস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন'-এর সমীক্ষা। অথচ তিন মাস আগে বিশেষজ্ঞরা যখন ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সৃষ্টির ভয়াবহতার কথা বলছিলেন, তখন মোদি সরকার ছিল আত্মসন্তুষ্ট। প্রধানমন্ত্রী নিজেই দাভোসের 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম'-এর সম্মেলনে 'কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় হয়ে গিয়েছে' বলে ঘোষণা করে এসেছিলেন। তার জন্য বিজেপির জাতীয় পদাধিকারীরা এক সভায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় প্রস্তাবও গ্রহণ করে। এরপর মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনও ঘোষণা করলেন 'করোনার খেলা শেষ'। ফলে ঢেউ যখন আছড়ে পড়লো, তখন দেখা গেল তাকে মোকাবিলা করার কোনও ব্যবস্থাই সরকারের নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় কিট নেই। হাসপাতালে বেড অমিল। নেই পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী। অক্সিজেনের চূড়ান্ত আকাল। অক্সিজেনের অভাবে রোগী মারা যাচ্ছে। আইসিইউ বেড নেই। ভেন্টিলেশন নেই। দিশেহারা হয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকল দেশবাসীকে টিকা দেওয়ার প্রশ্নেও সরকার দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টিকার পর্যাপ্ত যোগান নেই। তাতেও সরকারের টনক নড়েনি। দেখা গেল উত্তরাখণ্ডে কুম্ভমেলায় লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হচ্ছে। সেখান থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। সরকার নির্বিকার। বিজেপির নেতামন্ত্রীরা তখন এই ভয়াবহ সংক্রমণের ঢেউকে গুরুত্বহীন করে কয়েকটি রাজ্যে ভোট প্রচারে ব্যস্ত। দ্বিতীয় ঢেউকে রোখার পরিকল্পনা করবে কে? কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদাসীন অবহেলায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। এই সংক্রমণের অতি মাত্রাকে প্রতিহত করার উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নেই। অথচ এই ভয়াবহতাকে স্বীকার করলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে ভোট প্রচারে তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। এই অমার্জনীয় অপরাধেই 'দি ল্যানসেট' আশঙ্কা প্রকাশ করছে আগস্টের আগেই ভারতে মৃত্যুমিছিল ১০ লক্ষ ছাপাবে। কিন্তু মানুষের এই মৃত্যুস্রোত প্রতিহত করতে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে বিজেপির ভাবনা মোদির ধাক্কা-খাওয়া ভাবমূর্তিকে আবার কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, তা নিয়ে। সামনে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন, আছে ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচন। তাই আবার হিন্দুত্বের রাজনীতি, কিম্বা পাকিস্তান বিরোধী উগ্র জাতীয়তার জিগির সৃষ্টির পরিকল্পনার ছক তৈরি হবে, কিন্তু অতিমারির হাত থেকে মানুষের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হবে না। মানুষের জীবন এদের কাছে এমনই মূল্যহীন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com